দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 MAR 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় শত শত কোটি টাকা লুট

দেশে নিরক্ষরতার হার বেড়েছে : জোট সরকারের অনুগতরা এখনো রয়ে গেছে

শফিউল আলম দোলন

ডাকাতের কবলে পড়েছে দেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা। শত শত কোটি টাকা লুটপাট হয়ে গেছে গত একদশকে। আগের সরকারগুলোর আমলে এই অনিয়ম দুর্নীতি চুরির পর্যায়ে থাকলেও গত পাঁচ বছরে জোট সরকারের আমলে তা পরিণত হয় দুর্ধর্ষ ডাকাতিতে। অনিয়ম ও দুর্নীতির দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নিলেও পরবর্তীতে তার নিয়ন্ত্রণ চলে যায় আরো বড় বড় দুর্নীতিবাজদের হাতে। জনগণের কষ্টার্জিত ট্যাক্সের টাকা থেকেই সুদে আসলে পরিশোধ করা হবে বিদেশী দাতা সংস্থার ঋণের অর্থ। অথচ কত সহজেই না দেশের গরীব

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় শত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার থেকে। এ বঞ্চনা এবং এখাতের লুটপাট অনিয়ম এখনো অব্যাহত রয়েছে। জোট সরকারের দুর্নীতিবাজদের অনুসৃত ও অনুগত প্রেতাত্মারা এখনো রয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতর ও প্রকল্পগুলোতে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি অনিয়মের কৌশল পাল্টানো হয়েছে মাত্র।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিগত সরকারের আমলে শুধুমাত্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতেই প্রথম আড়াই বছরে ৬৩৫ কোটি টাকা লুটপাট হয়ে গেছে। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উপানুষ্ঠানিক খাতের এই মাত্রাছাড়া দুর্নীতি অনিয়ম আর লুটপাটে অসন্তুষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং এ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চোরের হাত থেকে মন্ত্রণালয়টি উদ্ধার করলেও পরবর্তীতে তা গিয়ে পড়ে দুর্ধর্ষ এক ডাকাতের হাতে। এদের প্রেতাত্মারাই এখনো চষে বেড়াচ্ছে মন্ত্রণালয়সহ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোতে। দেখার কেউ নেই। বলারও নেই কেউ।

জানা যায়, দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে ২০০৬ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ক্ষমতা কেড়ে নিলেও এরপর থেকে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নেন বগুড়ার সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান লালু। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের শতভাগ আর্শিবাদপুষ্ট লালু ছিলেন দুর্নীতি লুটপাটে এক বেপরোয়া জনপ্রতিনিধি। পোশাক পরিচ্ছদে ও চাল চলনে অনেকটা ফেনী জেলার সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল হাজারীর মত হলেও লুটপাট অপকর্মে লালুর শিষ্য হওয়ার যোগ্যতাও হাজারীর নেই। প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর দুটিতে চাকরি দেয়ার নামে জনপ্রতি লক্ষাধিক টাকা ঘুষ আদায়, গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় এনজিও নির্বাচনে চরম দুর্নীতি, প্রশাসনিক অদক্ষতা, টিএলএস প্রকল্প নিয়ে হরিলুট, টেন্ডারে অনিয়মসহ একের পর এক নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তদন্তে সেগুলো প্রমাণিতও হয়। ফলে তিনি অধিদপ্তরটিই বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে এই দুর্নীতি- অনিয়মের কারণে বিশ্বব্যাংক এডিবি, ইউনিসেপ, আইডিবি ও ইউএমএফপিও এর অর্থায়নে সাক্ষরতা উত্তর যেসব প্রকল্প চলছিল সেগুলোতে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয় সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ দাতাসংস্থা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, খালেদা সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের চরম দুর্নীতিই এই খাতটি বন্ধ হয়ে যাবার প্রধান কারণ। তিনি দুর্নীতি ও লুটপাটকে শুধু সমর্থনই করেননি, শেষ পর্যন্ত নিজেও আপাদমস্তক ডুবে যান দুর্নীতিতে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্রয়-বিক্রয় টেন্ডার শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি পর্যন্ত এমন কোন কাজ নেই যেখান থেকে অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম টাকা খাননি। আর এসব ক্ষেত্রে তার গড়ে তোলা দেশব্যাপী লুটপাটের নেটওয়ার্কের প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন- তারই একান্ত সচিব (পিএস) কাজী আসাদুল ইসলাম। সারাদেশ থেকেই এই আসাদুল ইসলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি-নিয়োগ কার্যক্রম থেকে অবৈধ অর্থ সংগ্রহ করতেন।

২০০৩ সালের প্রথমার্ধে শুধুমাত্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের ৬শ' ৩৫ কোটি টাকা লুটপাট করে নেয়া হয়। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য এনজিওগুলোকে না নিয়ে ভুয়া একশ্রেণীর এনজিওকে কাজ পাইয়ে দেয়ার জন্য লাখ লাখ টাকা উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সময় ৩শ' ২১টি এনজিওকে প্রত্যেকটিকে ২২ লাখ টাকা করে কাজ দেয়া হয়। এই এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি এনজিওর ক্ষেত্রেও যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়নি।

প্রতিটি এনজিও থেকেই মোটা অংকের নগদ টাকা ঘুষ নিয়ে তাদের কাজ দেয়া হয় বলে জানা যায়। এ নিয়ে ২০০৩ সালের ১৮ মে সকালে অধিদপ্তর ভবনের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচীর মাধ্যমে কোয়ালিশন অব লোকাল এনজিও (সিএলএন) নেতৃবৃন্দ এই দুর্নীতি-অনিয়মের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

পরবর্তীতে গণশিক্ষা খাতে সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৬২টি এনজিওকে অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। ওই সময় বিভিন্ন জেলায় দুটি প্রকল্পের আওতায় স্থানীয়ভাবে মোট ৪৬৭টি এনজিও সরকারের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা কার্যক্রম পালন করে। এসব দুর্নীতি-লুটপাটের কারণে ২০০৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প থেকে প্রায় ৬শ' কোটি টাকা ফেরত নিয়ে যায় ইউনিসেফ। বিশ্বব্যাংক ও এডিবিসহ অন্যান্য দাতারাও আরো দশটি প্রকল্পে অর্থায়নে চরম অনীহা প্রকাশ করে এবং এক পর্যায়ে দু'টি সংস্থা তা বন্ধ করে দেয়।

জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে ২০০২ সালে দেশে সাক্ষরতার হার যেখানে গড়ে ৬৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল সেখানে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলের প্রথম বছরে তা ৬৫ শতাংশে উন্নীত হলেও পরে তা হ্রাস পেয়ে ৬০ শতাংশেরও নিচে নেমে আসে। অর্থাৎ গণশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম কাগজপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে দেশব্যাপী নিরক্ষরতার হার আরো বেড়ে যায়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনা বিগত সরকারের আমলে তদন্তে প্রমাণীত হলেও এসবের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যরাসহ মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে যৌথভাবে চলে এ লুটপাট ও অনিয়ম। তাদের সবার পকেটেই যায় বাংলাদেশের গরীব জনগণের শ্রমে-ঘামে ও কষ্টের উপার্জিত এ টাকা। দাতা সংস্থাগুলোর এই ঋণ সাহায্যের টাকা জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকেই সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হয় সরকারকে। অথচ কত সহজেই তারা শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যাচ্ছে এদেশের গরীব সাধারণ মানুষকে। জনগণের প্রতি এই বঞ্চনা ও তাদের কষ্টার্জিত অর্থে এই দুর্ধর্ষ ডাকাতির বিচার করবে কে? এই প্রশ্নই এখন দেশব্যাপী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে।